মফস্বলের থিয়েটার

অমল রায়

শিল্পে স্থান মাহাত্ম্যও কম নয়। কলাকার হাজার চেষ্টা করেও স্থান কালের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারেন না। হয়ত-বা একটু দূরের হয়ে যায়, একটু অস্পষ্ট হয়ে আসে বড় জোর।

মফস্বলের থিয়েটার বলতে আমরা সাধারণত যে নাট্যকর্মকে চিহ্নিত করে থাকি, তা কিন্তু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত দেশজ লোকনাট্য নয়, তা হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার, বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মফস্বলি সংস্করণ। মফস্বলের থিয়েটার শহরের সংশ্রববর্জিত দূরতম কোনও গ্রামের নাট্যকর্ম নয়। অত দূরে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটারও আজ পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি। সেখানকার লোকসাধারণ এখনও লোকায়ত নাট্যকলার নানা রূপকেই নাট্যরস আস্বাদনের জন্য আঁকড়ে ধরে থাকেন। মফস্বলের থিয়েটার গ্রাম বাংলার সেই সব প্রান্তিক ভূমিতে আজও পা ফেলতে পারেনি। সেখানে সে-ও বহিরাগত। কলকাতা মহানগরী বলতে আমরা শুধু কলকাতা পৌরনিগমের এলাকাকে না ধরে বৃহত্তর কলকাতা—অর্থাৎ সি. এম. ডি. এ অঞ্চলকেও ধরতে পারি। তাহলে কলকাতার থিয়েটার যদি রাজধানীর থিয়েটার বা মেট্রোপলিটান থিয়েটার হয়ে থাকে, মফস্বলের থিয়েটার হল কলকাতার চেয়ে ছোট শহরের, আধা-শহরের, প্রায়-শহরের বা বড়জোর বর্ধিষ্ণু গঞ্জের থিয়েটার, কখনওই তা গ্রামীণ লোকায়ত নাট্যকলা নয়।

আর এখানেই একটা বড় রকমের সংশয় কণ্টকিত জিজ্ঞাসার চিহ্ন ঝুলে থাকে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রচলিত আছে, তাদের মধ্যে নাট্য-উপস্থাপনাগত কিছু-কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। তার কারণ, বাঁধা মঞ্চ বা প্রসেনিয়াম থিয়েটার বলতে আমরা আজ যা বুঝি, তা মূলত ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের। এই ইয়োরোপীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক শক্তির তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে গ্রাস করার সূত্রে। আর ইয়োরোপের বাইরে সর্বত্রই এই প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রধানত গড়ে উঠেছে রাজধানী বা বড়-বড় শহর-গুলিতেই। তার কারণ—ঔপনিবেশিক শাসন ছিল মূলত নগরকেন্দ্রিক, তাই ইয়োরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবও নাগরিক পরিমণ্ডলটিকে খুব একটা অতিক্রম করতে পারেনি। প্রায় সর্বত্রই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে লোকায়ত দেশজ নাট্যকলার নানা রূপের চর্চা চলেছে, অনেকটা নগরের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সমান্তরাল একটি ধারা

হিসাবেই।

একথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও সত্য। আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটারও ব্রিটিশ আধিপত্যের সাংস্কৃতিক উপজাত ফল। যদিও ভারতীতিহাসের আদি পর্বে এদেশেও রাজসভাপৃষ্ঠ-পোষিত বাঁধা মঞ্চে নাট্যানুশীলনের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল, সংস্কৃত নাটকের স্বর্ণযুগের সেই পরম্পরা কিন্তু অব্যাহত থাকেনি, মধ্যযুগের তুর্কি মোঘল শাসনের যুগে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষণার অভাবে ক্রমশ মঞ্চের সেই দেশীয় নাট্যরীতি পরিত্যক্ত ও অপ্রচলিত হয়ে যায়। বরং দেশজ লোকনাট্যেরই একটি অব্যাহত ধারাবাহিকতা বজায় থেকে গেছে, যেহেতু সে চিরদিনই রাজশক্তির আনুকূল্যবঞ্চিত ব্রাত্য ও অন্ত্যজ, তাই রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিপতিকুলের পালাবদলে তার কিছু এসে যায়নি, সে তার মতো করেই বেঁচে থেকেছে, নিজস্ব ভূমি থেকে আহরণ করেছে প্রাণরস। এই লোক-নাট্যকলার কিন্তু কোনও সাধারণ রূপ কোনও কালেই ছিল না। অঞ্চলভেদে আঙ্গিকের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ গড়ে উঠেছিল। তবে সমস্ত লোকনাট্যেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তা কিন্তু বাঁধা মঞ্চের নাটক নয়, তা প্রধানত পথ-ঘাট ও মাঠ-ময়দানের নাটক, কখনও-বা মিছিলের মতো চলমান নাটকও।

আমাদের আধুনিক থিয়েটার কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় লৌকিক নাট্যরীতির বিবর্তিত রূপ নয়। আগেই বলেছি এ থিয়েটার বৈদেশিক আধিপত্যের হাত ধরে আসা ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের প্রসেনিয়াম থিয়েটার। স্বভাবতই এ থিয়েটার চরিত্রের দিক থেকে নাগরিক। কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারও নাগরিক থিয়েটার, মফস্বলের থিয়েটারও তাই। তফাতটা শুধু বড় শহরের সঙ্গে ছোট শহরের বা আধা ও প্রায়-শহরের। তদুপরি যে সাধারণ লক্ষণগুলোর জন্যে কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মিল রয়েছে, সেই মিল অল্পবিস্তর মফস্বলের থিয়েটারের সঙ্গেও আছে। যেটুকু অমিল তা আধুনিকতম মঞ্চোপকরণের অভাবজনিত, মৌলিক কোনও প্রভেদ নেই।

অবশ্য একথাও আমাদের মানতে হবে ইয়োরোপীয় প্যাটার্নের প্রসেনিয়াম থিয়েটার যে পৃথিবীর অন্যত্রও নাগরিক নাট্যচর্চার প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটা শুধু ইয়োরোপীয় বিভিন্ন দেশের উপনিবেশ বিস্তারের অনুষঙ্গ হিসাবেই নয়, ওই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মাধ্যমগত অন্তর্নিহিত প্রচন্ড শক্তিও এর কারণ। বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে বিভিন্ন দেশের যে নাটকগুলি সেরা সৃষ্টি হিসাবে বন্দিত হয়েছে, তার বেশির ভাগই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা। আর সেইজন্যেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি বিশ্বজনীন নাট্যভাষা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কিন্তু তার মানে এই নয়, প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দেশভেদে-অঞ্চলভেদে কোনও পার্থক্য নেই। স্থানগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত না হলে কোনও শিল্পকলারই সজীব বিকাশ ঘটে না। ফলে মূল সাধারণ চরিত্রটি এক থাকা সত্ত্বেও তা দেশে-দেশে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ নিয়েছে, সেই দেশগুলির নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ও পারম্পর্যকে আত্মস্থ করেই একেকটি

দেশের থিয়েটার একেক রকমের চেহারা নিয়েছে, ব্রিটিশ থিয়েটার, ফরাসি থিয়েটার বা রুশ থিয়েটার তাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয়েছে। ফলে এইসব থিয়েটার একটি মূলগত সর্বজনীন ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়েও জাতীয় থিয়েটার হতে পেরেছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বিষয়টি অবশ্য অন্যরকম। যদিও ইদানীং 'ভারতীয় থিয়েটার'-এর একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব রূপরীতি অন্বেষণের জন্যে বহু নাট্যবিদ আদাজল খেয়ে লেগে পড়েছেন, তথাপি 'ভারতীয় থিয়েটার' বলে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও কিছু অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। এই দেশে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চর্চা লেবেদফের পূর্বসূত্রবিরহিত ও পরবর্তী যুগে প্রভাবহীন বিচ্ছিন্ন চেষ্টাটিকে ধরলে দুশো বছর এবং না ধরলে প্রায় দেড়শো বছর ধরে চলছে, তথাপি 'ভারতীয় প্রসেনিয়াম থিয়েটার' বলে কোনও কিছু গড়ে ওঠেনি। ইদানীং যে সব 'জাতীয় নাট্যমেলা' হয়ে থাকে, সেখানে বহু আঞ্চলিক লোকনাট্যকেও প্রসেনিয়াম মঞ্চে হাজির করা হয়, তিজন বাইয়ের 'পাণ্ডবানি' তো কোনওভাবেই প্রসেনিয়াম থিয়েটার নয়।

অবশ্য একথাও ঠিক, বৈদেশিক প্রভাবসঞ্জাত প্রসেনিয়াম থিয়েটারকে জাতীয় চরিত্র দিতে গেলে তার চালচিত্রে স্বদেশি আদল আনতেই হবে, আর এক্ষেত্রে দেশজ লোকনাট্যের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তার মেলবন্ধন ঘটাতেই হবে। সেদিক থেকে 'জাতীয় নাট্যমেলা'-য় লোকনাট্যের আবাহনের পিছনে নিশ্চয়ই একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু গলদটা সম্ভবত বিসমিল্লাতেই। ভারতীয় থিয়েটার নামক অলীক সোনার হরিণটিকে আমরা কোথায় খুঁজে পাব?

তা ছাড়া, বহু জাতিসত্তা, বহু ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী অধ্যুষিত এই ভারতীয় উপ-মহাদেশে ভারতীয় থিয়েটার বলে আদপেই কোনও কিছু তৈরি হতে পারে না, এমন কি দেশজ লোকনাট্যের মশলা মিশিয়েও না। কার্যত আমরা বাঙালির থিয়েটার বুঝি, মরাঠি থিয়েটার বুঝি, গুজরাতি থিয়েটার বুঝি, তেলেগু, তামিল বা মালয়ালম থিয়েটার বুঝি, কিন্তু ভারতীয় থিয়েটার বুঝি না। এইসব কিছু মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ির নাম যদি কেউ ভারতীয় থিয়েটার দিতে চান, দিতে পারেন, কিন্তু যে অর্থে নরওয়েজিয় বা জাপানি থিয়েটার তাদের জাতীয় থিয়েটার, সে অর্থে ভারতীয় থিয়েটার কদাপি নয়। আর তা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিকাশও সমানভাবে ঘটেনি, ফলে বাংলায় নাট্যচর্চার প্রধান মাধ্যম যেমন প্রসেনিয়াম থিয়েটার, অন্য বহু প্রদেশেই তা নয়, সেখানে লোকায়ত নাট্যকলার বিভিন্ন রূপই জনমানসের নাট্যরস আস্বাদনের প্রধান ক্ষেত্র।

মফস্বল বাংলার থিয়েটারের আলোচনার সূত্রে ভারতীয় থিয়েটার পর্যন্ত দৌড়নো অনেকের কাছে ধান ভানতে শিবের গীত বলে মনে হতেই পারে। কিন্তু যেহেতু আমরা মফস্বল বাংলার থিয়েটারের নিজস্ব কোনও স্বতন্ত্র রূপরীতি আছে কিনা তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি, সুতরাং এই বিষয়টি তথাকথিত ভারতীয় থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতেও

আলোচনা করতে হবে। আমরা দেখলাম, ভারতীয় থিয়েটারের কোনও অবিভাজ্য একক রূপ নেই, যা আছে তা হল, ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তাগুলির নিজস্ব থিয়েটার। যেমন আমাদের বাংলা থিয়েটার বা বাঙালির থিয়েটার। এই বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর থিয়েটারকেও আমরা ইদানীং কলকাতার থিয়েটার ও মফস্বল বাংলার থিয়েটার এই দুই ভাগে ভাগ করে বিচার করতে শুরু করেছি। এটা কতদূর বাস্তবসম্মত, এই প্রশ্ন আজ আমাকেও কুরে-কুরে খাচ্ছে। যদিও একদা আমি নিজেই ছিলাম মফস্বল বাংলার থিয়েটারের স্বাতন্ত্রগর্বিত থিয়েটারি সেপাই, তথাপি আজ আমাকেও ফিরে দেখতে হচ্ছে। বিভাজনটা যদি হতো—বাংলার নগরসভ্যতার প্রতিনিধি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের নাট্যকলা লোকনাট্যের মধ্যে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাজনের অন্তত কিছুটা যৌক্তিকতা থাকত। যদিও এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে—যা আমরা আগেই সংক্ষেপে বলেছি, দেশজ লোকনাট্যেরও কোনও একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপরীতি নেই, এটা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটেই সত্য নয়, এটা সত্য ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ বাংলার লোকনাট্যেরও কোনও সর্বজনীন রূপ নেই, শুধু জেলাভেদে নয়, একই জেলা বা একই মহকুমার মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লোকায়ত নাট্যকলা প্রচলিত। অনেকে অবশ্য যাত্রার কথা তুলবেন। যদিও যাত্রা উৎসে একটি লৌকিক নাট্যমাধ্যমই ছিল, কিন্তু নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজ সে যেখানে পৌঁছেছে, বিশেষত বাণিজ্যিক প্রসেনিয়াম থিয়েটার এবং চলচ্চিত্রের কু-প্রভাবে তার যাত্রাপথ যেখানে গিয়ে আপাতত শেষ হয়েছে, সেখানে সে ফর্মের দিক থেকে অনেকটা মিশ্র রীতির এবং সেই সঙ্গে সর্বজনীন হয়ে উঠলেও তার লোকায়ত চরিত্র বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া মফস্বলের থিয়েটার লোকনাট্য নয়, যাত্রাও নয়, সেটাও কলকাতার মতোই প্রসেনিয়াম থিয়েটার। তাহলে কী সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা মফস্বলের নাট্যচর্চাকে কলকাতার থিয়েটারের থেকে পৃথক করেছে।

এই বিভাজন প্রসেনিয়াম বা নন-প্রসেনিয়াম বা অফ-প্রসেনিয়াম নাট্যরীতিরও নয়। বাদলবাবুদের থার্ড থিয়েটারের চর্চা মফস্বলের কিছু নাট্যসংস্থা—যেমন, ঋতম বা লিভিং থিয়েটার বা পথসেনা—করে থাকেন, তেমন করেন কলকাতার শতাব্দীও। তা হলে এ ক্ষেত্রে কলকাতা ও মফস্বলের ফারাক বোঝাও যায় না। তাছাড়া মফস্বল বাংলার থিয়েটার বলতে আমরা যা বুঝি, তা যে প্রধানত প্রসেনিয়াম থিয়েটার একথাও বারবার বলা হয়েছে।

আসলে বাংলা নাট্যচর্চাকে প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও লোকনাট্য, প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও যাত্রা, প্রসেনিয়াম থিয়েটার ও নন বা অফ-প্রসেনিয়াম বা স্টিট-থিয়েটার, মুনাফালোভী পেশাদার থিয়েটার ও অবাণিজ্যিক অপেশাদার থিয়েটার কিংবা কমার্শিয়াল থিয়েটার, জীবনমুখি ও শিল্পশোভন গ্রুপ থিয়েটার ও অ্যামেচার থিয়েটার—এই রকম নানা বিভাগে বিভক্ত করা যতটা সহজ, সম্ভবত ততটা সহজ নয় কলকাতা ও মফস্বলে ভাগ করা। কেননা উল্লিখিত প্রতিটি বিভাজিত অংশই কলকাতাতেও আছে, মফস্বলেও আছে, এক

স্থায়ী পেশাদার মঞ্চ ছাড়া। এটা কেবলমাত্র কলকাতাতেই আছে, মফস্বলের দুয়েকটা শহরে এ ধরনের নিয়মিত বাণিজ্যিক নাট্যপ্রযোজনার চেষ্টা হলেও তা স্থায়ী হয়নি। তবে মফস্বলও পেশাদার বাণিজ্যিক থিয়েটারের কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, কেননা কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটার মফস্বলে প্রায়ই কল শো করতে যায়। তা ছাড়া একেবারে হালফিল ওয়ান ওয়াল থিয়েটার নামে কলকাতায় একটি খুড়োর কল তৈরি হয়েছে, যা যাত্রা এবং প্রসেনিয়াম থিয়েটারের একটি ককটেল ছাড়া কিছু নয় এবং এটা তৈরিই করা হয়েছে মফস্বলে কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের পসরা নিয়ে যাত্রার জন্যে, শুধু শহরগুলিতে নয়, দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও এটা যেতে শুরু করেছে।

এত সব বলার পরেও কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, যদিও কলকাতার থিয়েটার ও মফস্বলের থিয়েটারের মধ্যে মৌলিক কোনও প্রভেদ নেই এবং গুণগত বিচারেও কলকাতাই শ্রেষ্ঠ এবং মফস্বল হীনতর—বা উল্টোটা—এমনটিও বলা চলে না—(কুমার রায়ের বহুরূপীর আর বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ব্রি-তীর্থের 'গালিলিও' প্রযোজনা দেখিয়ে দিয়েছে—কেউ কারুর থেকে কম যায় না।) তথাপি মফস্বল বাংলার থিয়েটার আলাদা করে কেন আজ আমাদের মনোযোগ দাবি করছে, কেনই বা আজ অনেকেই বিশ্বাস করছেন—মফস্বলের থিয়েটারের সত্যিই বর্তমানে কলকাতা-নিরপেক্ষ একটি নিজস্ব চেহারা গড়ে উঠেছে, সে কথা বোধহয় আরেকটু তলিয়ে বোঝবার দরকার আছে। সবটাই অলীক কিংবদন্তী নয়, আর তা ছাড়া কিংবদন্তীরও ভিত্তিভূমিতে কিছু সত্যের বনিয়াদ থেকে যায়।

আসলে ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটার দীর্ঘদিনের উপেক্ষা, অবহেলা ও অনাদরের অন্ধকার ছিন্ন করে পাদপ্রদীপের আলোয় নতুন করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং কলকাতার থিয়েটারের প্রতিস্পর্ধী হিসাবে সগর্বে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এটা অবশ্য গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে। আমি এখানে বাণিজ্যিক থিয়েটার বা অ্যামেচার থিয়েটারের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না। এই পর্বে আমার সমস্ত আলোচনাই কলকাতা ও মফস্বলের গ্রুপ থিয়েটার হিসাবে চিহ্নিত নাট্যদল-গুলিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে।

মনে থাকতে পারে—ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ শেষ পাঁচটি বছরে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামোয় একটা বিশাল ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই অগ্নিগর্ভ উত্তাল সময়ের কতটুকু প্রতিফলন পড়েছিল সেদিন কলকাতার থিয়েটারে? না, গ্রুপ থিয়েটার নামটি তখনও প্রচলিত হয়নি। গণনাট্য সঙ্ঘ বেশ কয়েকবার হল ভেঙে গেছে বা সক্রিয়তা হারিয়েছে। গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা শক্তিশালী নাট্যদলগুলি তখন নবনাট্যের (পরে সংনাট্য) তত্ত্ব আমদানি করে মঞ্চে জনজীবনের রূপময় নাট্যভাষ্য নির্মাণের বদলে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতবিহীন ব্যক্তিমানসের সমস্যা-সঙ্কট-দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের রহস্যময় অবচেতন অন্ধকারে ডুব দিয়ে ঝিনুক কুড়োতে ব্যস্ত। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন ও বন্দীমুক্তির দাবি তাঁদের বেশিরভাগকেই তেমনভাবে

স্পর্শ করতে পারেনি, অন্তত তাঁদের নাট্যকর্মে তার প্রকাশ নেই। অবশ্যই এই পরিমণ্ডলে উৎপল দত্ত ছিলেন মহৎ ব্যতিক্রম। এল. টি. জি-র নাটকে সেই দুঃসময়েও বিদ্রোহের রক্তকেতন উড়েছিল। উৎপল দত্ত, জ্যোছন দস্তিদারদের জেলেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম তো মূল প্রবাহ নয়। কলকাতার থিয়েটারের মূল প্রবাহে কিন্তু উত্তপ্ত সমকালের প্রতিফলন নেই। হ্যাঁ, এইসময় থেকেই মফস্বলের নাট্যদলগুলি অন্তত সমাজমনস্কতার প্রশ্নে কলকাতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে।

এই সময়েই মফস্বলে নাট্যপ্রতিযোগিতাগুলির প্রচলন শুরু হয় প্রধানত বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে। ১৯৬২ সালে বামপন্থী আন্দোলন আক্রান্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে মফস্বল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্য প্রতিযোগিতার নামে বামপন্থী নাটক করার একটি পরিকাঠামো গড়ে উঠতে থাকে অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আর এইভাবেই সেই দুঃসময়ে, গণতান্ত্রিক অধিকারহীন কালবেলায় বাংলা নাটক অন্তত মফস্বল বাংলায় গণপ্রতিবাদের বলিষ্ঠ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ঠিক এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল নকশালপন্থী আন্দোলনের ভাঁটার সময়ে, সাতের দশকে, যখন গণআন্দোলনের নেতারা কারাবন্দী, সেই সময় মফস্বল বাংলার প্রতিযোগিতামঞ্চে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রক্তকেতন উড়েছিল—এ প্রসঙ্গে একটু পরে বিস্তারিত আলোচনা করব। আপাতত মফস্বলে নাট্য প্রতিযোগিতাগুলির উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতটি সংক্ষেপে বুঝে নিতে চাই। যদিও নাট্যপ্রতিযোগিতার শুরু কলকাতাতেই, পাঁচের দশকে বিশ্বরূপা আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতা বা থিয়েটার সেন্টারের নাট্যপ্রতিযোগিতাকে ঐতিহাসিকভাবে এই ধারার প্রবর্তক বললেও কলকাতাতে কিন্তু কখনওই নাট্যপ্রতিযোগিতার ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি এবং এখনও কলকাতায় কয়েকটি নাট্যপ্রতিযোগিতার আসর বসলেও প্রতিযোগিতামঞ্চ কখনওই কলকাতার নাট্যচর্চার, এমন কি বামপন্থী নাট্যচর্চারও প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বিশেষত ভারত-চীন সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের পর থেকে মফস্বলে নাট্যপ্রতিযোগিতার আসর বসতে থাকে এবং ক্রমশ মফস্বলবাংলার নাট্যচর্চা আবর্তিত হতে থাকে প্রতিযোগিতামঞ্চকে ঘিরেই। বস্তুত নাট্যপ্রতিযোগিতাগুলিই হয়ে ওঠে মফস্বলের থিয়েটারের প্রধান মাধ্যম। আর এখানে, এই প্রতিযোগিতাগুলির ক্ষেত্রে, আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। যদিও মফস্বলে আগেও যেমন কিছু-কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং এখনও স্বল্পপরিমাণে হয়ে থাকে, তবু মফস্বলের অধিকাংশ নাট্যপ্রতিযোগিতাই কিন্তু একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা। উপযুক্ত মঞ্চোপকরণের অভাবের জন্যেই হোক বা মহিলা শিল্পীর অপ্রতুলতার জন্যেই হোক (কেননা, পূর্ণাঙ্গ নাটকে মহিলা চরিত্র না থাকাটা নেহাতই ব্যতিক্রম, বেশিরভাগ পূর্ণাঙ্গেই একাধিক নারীচরিত্র থাকে। অথচ একাঙ্ক নাটক স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত হতে কোনও বাধা নেই এবং বেশিরভাগ একাঙ্ক নাটক তাই-ই হয়ে থাকে।) মফস্বলের থিয়েটারে একাঙ্ক নাটকই প্রধানত অভিনীত হয়ে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমার্ধেই মফস্বলে একাঙ্ক

নাটক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে নিমতার সংগঠনী ক্লাব. নৈহাটির যান্ত্রিক, চুঁচুড়ার কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রভৃতিকে পথিকৃতের মর্যাদা দিতে হবে। দু-এক বছর আগুপিছু এঁরাই একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতা শুরু করেন, যা পরে ঝড়ের মতো মফস্বল বাংলার অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য নথিবদ্ধ করা উচিত উল্লিখিত তিনটি সংস্থাই কিন্তু মোটামুটি বামপন্থী রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

এই আলোচনা থেকে আমরা ছয়ের দশকে মফস্বলের নাট্যচর্চার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পেলাম, তা থেকে মফস্বলের থিয়েটারের তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ছে। এক, রাজনীতি, বিশেষত বামপন্থী রাজনীতির নাট্যভাষ্য নির্মাণ মফস্বলের থিয়েটারের অভীষ্ট। কলকাতাতেও সেই যুগে বামপন্থী থিয়েটারের দল ছিল, কিন্তু উৎপল দত্তের মতো বড় মাপের নাট্যব্যক্তিত্বের অবস্থিতি সত্ত্বেও সেটিই প্রধান ধারা ছিল না। অথচ মফস্বলের প্রতিটি সিরিয়াস নাট্যদলই রাজনীতি-সচেতন শুধু নয়, তা বাম রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীলও বটে। দুই. মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত আবর্তিত হতে থাকে প্রতিযোগিতা-মঞ্চকে কেন্দ্র করে। কলকাতায় নাট্যপ্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটলেও কখনও তা মফস্বলের মতো ব্যাপকতা পায়নি। তিন, মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত একাঙ্ক নাটক নির্ভর। বস্তুত সাম্প্রতিক কালে বাংলা একাঙ্ক নাটকের যেটুকু সমৃদ্ধি ঘটেছে, তার সবটুকুই মফস্বলের নাট্যকর্মীদের অবদান। কলকাতায় যে একেবারে একাঙ্ক নাটকের চর্চা হয় না তা নয়, কচিৎ বড় দলগুলিও একাঙ্ক নাটক করে থাকেন বটে, তবে তা তাঁদের অবসরের খেলা মাত্র। আর মফস্বলের নাট্যদলগুলির কাছে একাঙ্ক নাটক শুধু আত্মপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম নয়, তা হল তাঁদের আত্মার আনন্দ। পূর্ণাঙ্গ নাটক কদাচ কখনও মফস্বলের দলগুলি প্রযোজনা করলেও, তা সংখ্যার দিক থেকেও যেমন কম, মানের দিক থেকেও বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ বা বহরমপুর রেপার্টরি থিয়েটার বা ছাদ্দিকের মতো কিছু ব্যতিক্রমী দলকে বাদ দিলে কলকাতার তুলনায় দীনতর। আসলে পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে কলকাতা এবং মফস্বল একেবারেই বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে।

অবশ্যই এগুলিকে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে মফস্বলের নাট্যচর্চার পার্থক্য হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এই ফারাকটি কিন্তু ছয়ের দশকের আগে এতটা প্রকট হয়নি। এর আগে মফস্বলের থিয়েটার ছিল অনেকটাই অ্যামেচার থিয়েটার। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চকেই হুবহু অনুকরণ করার পবিত্র কর্তব্যে নিরত ছিল। রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে যে নাটকগুলি 'হিট' বা জনসমাদৃত হতো, সেগুলিই মফস্বলে পুজোর সময় বা পালা-পার্বণে পুনরাভিনীত হতো। প্রায় সব মফস্বল শহরেই একজন করে নকল দানীবাবু, নকল নরেশ মিত্র, নকল শিশির ভাদুড়ি, নকল দুর্গাদাস, নকল নির্মলেন্দু লাহিড়ি, নকল অহীন্দ্র চৌধুরির সসম্মানে বিরাজ করতেন। সাধারণত জমিদারবাবুরা এইসব থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মফস্বলের বহু অঞ্চলে এঁরা এইসব বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠানের জন্যে বাঁধা মঞ্চও তৈরি

করে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে এমন একটি প্রাচীন মঞ্চ দেখে এসেছি, যেখানে দানীবাবু 'কল শো' করে গেছেন। যেখানে মঞ্চ ছিল না সেখানে নাটমন্দিরে বা অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের সাধ্যমতো অনুকরণ করত।

মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার যে গোড়া থেকেই কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিল, এমনটা কিন্তু জোর দিয়ে বলা যাবে না। আগেই বলা হয়েছে—মানসিক প্রবণতার বিচারে বাংলা থিয়েটারের তিনটি ধারা—সখ মেটাবার জন্যে নাটক করে অ্যামেচার থিয়েটার, মুনাফার লোভে নাটুকে ব্যবসা করে বাণিজ্যিক থিয়েটার এবং যে থিয়েটার নাট্যশিল্পের প্রতি আভ্যন্তরীণ আনুগত্যে বা সমাজমনস্ক প্রতিবাদী ভূমিকা পালনের জন্যে লড়াই করছে, ইদানীং তার শিথিল পরিচয় গ্রুপ থিয়েটার। যেহেতু মুখে রঙ মেখে 'অ্যাক্টো' করার জন্যেই অ্যামেচার থিয়েটারের জন্ম, তাই তার প্রতি, সিরিয়াস নাট্যপ্রেমী মানুষের করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা জন্ম নিয়েছে। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সূচনাপর্বে অ্যামেচার থিয়েটারই ছিল আমাদের নাট্যচর্চার শুধু প্রধান নয়, একমাত্র প্রবাহ। শোভাবাজার, পাথুরিয়াঘাটা বা জোড়াসাঁকোর জমিদার বাড়িতে যে বাংলা থিয়েটার হতো সাহেবদের ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে সেগুলোর পেছনে যতটা না ছিল নাট্যকলার উন্নতির প্রয়াস, তার চেয়ে বেশি ছিল ইংরেজের সংস্পর্শে এসে অর্থনৈতিক ভাবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার-নন্দন, মধ্যস্বত্বভোগী মুৎসুদ্দি, ফড়ে ও বানিয়াদের আলোকপ্রাপ্ত সংখ্যালঘু অংশের 'প্রগতিশীল' সৌখিনতা—অন্য পশ্চাৎপদ বৃহদংশটি যখন বেড়ালের বিয়ে দিত, বুলবুলির লড়াই বাঁধাত, বাঈ নাচ দেখত, এঁরা তখন 'থ্যাটার' করতেন। তাই চরিত্রের দিক থেকে এই থিয়েটার অ্যামেচার থিয়েটারই, যদিও এর কুশীলবরা অনেকেই ছিলেন বেতনভুক কর্মচারি মাত্র। বাংলা থিয়েটারের এই আদি পর্বের অ্যামেচার থিয়েটার কলকাতাতেই শুধু হতো না, মফস্বলের কোথাও কোথাও এই সময়েই হয়েছিল মফস্বলের জমিদারবর্গের পৃষ্ঠপোষণায়। মফস্বলের এই আদি পর্বের অ্যামেচার প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিশ্চয়ই কলকাতার অনুকরণ করত না, কেননা—কলকাতায় তখনও থিয়েটারের কোনও নিজস্ব ধরানা তৈরি হয়নি, তা ছাড়া বাংলার সংস্কৃতিতে কলকাতার প্রভাব তখনও সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটার তখনও কলকাতার মুখাপেক্ষী ছিল না। "স্বদেশী যাত্রা বিলাতী থিয়েটার" গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর মফস্বলের অ্যামেচার থিয়েটারের নিজস্ব স্বাতন্ত্রচিহ্নিত কয়েকটি নাট্যপ্রযোজনার উল্লেখ আছে।

মফস্বলে কলকাতার থিয়েটারি প্রভাব পড়তে শুরু করে ১৯৭২ সালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টির ফলে নিয়মিত নাট্যপ্রযোজনার রীতি চালু হবার পর থেকে। যেহেতু মফস্বলে নিয়মিত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে থিয়েটার চলার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল না, তাই এখন থেকে মফস্বল বাংলার অ্যামেচার থিয়েটার পুরোপুরি কলকাতা নির্ভর

হয়ে ওঠে। এই নির্ভরতার হাত থেকে মফস্বলের থিয়েটার মুক্তি পায় এই শতাব্দীর ছয়ের দশকে এসে। এমনকি, চল্লিশের দশকের গণনাট্য সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলা থিয়েটারে অ্যামেচার ও পেশাদার থিয়েটারের বাইরে যে সমাজ সচেতন ও গণমুখি নাট্যধারার সূচনা হল, যার পরিণতিতে গ্রুপ থিয়েটারগুলির জন্ম, সেই গণনাট্য সঙ্ঘও সেদিন মফস্বল-বাংলার থিয়েটারের চালাচিত্রে তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। গণনাট্য সঙ্ঘ ও তার যুগান্তকারী নাট্যপ্রযোজনা "নবান্ন" সম্পর্কে যত ইতিবাচক কথাই বলা হোক না কেন, তবুও একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, গণনাট্য কলকাতার থিয়েটারকে প্রভাবিত করলেও, এমনকি পেশাদার থিয়েটারে শিশির ভাদুড়িকে "দুঃখীর ইমান" নামাতে অনুপ্রাণিত করলেও মফস্বল বাংলায় তার প্রভাব-বলয়টি বহু পরে বিস্তৃত হয়েছিল। যদিও সেই সঙ্গেই মফস্বলের কোনও কোনও অঞ্চলে গণনাট্যের শাখা গড়ে উঠেছিল, তবু মফস্বলের থিয়েটার প্রধানত, দীর্ঘদিন পর্যন্ত কলকাতার পেশাদার থিয়েটারের দাসত্ব করেছে, হয়ত বা কখনও-সখনও কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের সমাদৃত কোনও নাটক মফস্বলে মঞ্চস্থ হয়েছে, তাও নিতান্ত কম, তবু তা এক ধরনের কলকাতা-নির্ভরতা তো বটেই! অর্থাৎ মফস্বলেও অন্য ধরনের যে থিয়েটার আস্তে-আস্তে গড়ে উঠছিল, তাও ছিল কলকাতার প্রভাবেই প্রভাবিত, নিজস্ব কোনও নাট্যভাষা তৈরির তাগিদ সেখানে ছিল না।

ষাটের দশক, বিশেষত তার শেষার্ধ থেকেই মফস্বল বাংলা তেজী ঘোড়ার মতো বাংলা থিয়েটারের প্রশস্ত অঙ্গনে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। সেটা মূলত তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যে। নকশালবাড়ির ঘটনা ঘটার পর সারা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত তার যুবমানসে যুগান্তকারী পরিবর্তনের দোলা লাগল, কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারে তার প্রভাব যতটা না পড়েছিল, তার শতগুণ বেশি প্রভাব পড়েছিল মফস্বলের ছোট ছোট নাট্যদলে। অস্বীকার করার উপায় নেই কলকাতার মঞ্চেও নকশালবাড়ির রাজনীতির প্রভাবে "তীর" থেকে শুরু করে "চাকাভাঙা মধু,", "কলকাতার হ্যামলেট" "পদ্য-গদ্য-প্রবন্ধ" ইত্যাদি অসাধারণ শিল্পগুণান্বিত নাটক নেমেছে; কিন্তু ৭২ সাল থেকে স্বৈরাচারী বর্বরতার অন্ধকার কালরাত্রি শুরু হবার পর থেকে, বিশেষত জরুরি অবস্থার রক্তচক্ষু প্রদর্শনের পর থেকে কলকাতার থিয়েটার তার একদা তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকা ক্রমশ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং কোনও না কোনওভাবে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোস করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে থাকে। ঠিক এই সময়েই মফস্বল বাংলার দুঃসাহসী ছোট ছোট নাট্যদলগুলি স্বৈরতন্ত্রের আঁধার শাসন ছিন্নভিন্ন করে নকশালবাড়ির সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি মঞ্চে-মঞ্চে প্রচার করে বেড়িয়েছে শুধু নয়, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনজাগরণ সৃষ্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে মফস্বল বাংলার নাট্যকর্মীরা নাট্যপ্রতিযোগিতা ও নাট্যোৎসবের মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী যে সমস্ত নাটক একের পর এক নামিয়ে গেছেন, তার সবগুলিই হয়ত শিল্পোত্তীর্ণ ছিল না, কিন্তু সময়ের সত্যকে তা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল, দেশ ও কালের

প্রতি দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বৈরতন্ত্রবিরোধিতার প্রশ্নটিকে অকুতোভয়ে যে সমস্ত নাট্যদল তুলে ধরেছিল, তাদের মধ্যে নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন নৈহাটির যান্ত্রিক, অকালপ্রয়াত নাট্যকার রাধারমণ ঘোষের নেতৃত্বাধীন হাওড়ার ইউ. টি. সি. ও পরে কালপুরুষ নাট্যসংস্থা, সম্প্রতি প্রয়াত শক্তিশালী নট ও নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন উত্তরপাড়ার ইউনিট থিয়েটার, প্রতিভাবান অভিনেতা ও নির্দেশক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, মনোরঞ্জন ঘড়ার নেতৃত্বাধীন শৌভিক (দক্ষিণেশ্বর) ও পরে ব্যঞ্জনা, খ্যাতিমান নট ও নির্দেশক শ্রীকুমার ঘোষের নেতৃত্বাধীন বারাকপুরের নটতীর্থ, বিজয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন কোন্নগর-নবগ্রামের কিংশুক, অকালপ্রয়াত অসিত ঘোষের নেতৃত্বাধীন নাট্যবৃত্ত, সুচারু দাস ও সমর চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন চন্দননগরের ক্লাসিক, সমর দত্তের নেতৃত্বাধীন চেনা-অচেনা, দিব্যেশ লাহিড়ির নেতৃত্বাধীন বহরমপুরের প্রান্তিক, সলিল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তারকেশ্বরের অভিযান ও অগ্রগামী, অমল মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বাটানগর থিয়েটার ইউনিট, বাটানগর থিয়েটার ওয়ার্কস, অমৃত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গরিফার ভিন্নভিষাস, চুঁচুড়ার কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থা, প্রতিষ্ঠিত নট ও নির্দেশক সুব্রত দত্তের নেতৃত্বাধীন মহেশতলার অন্বেষক, শিলিগুড়িতে অমল চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন নাট্যদলগুলির কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করাই যেতে পারে, নিশ্চয়ই অনেক সংস্থার নাম এখানে বাদ গেল, এই নিবন্ধলেখকের বিস্মরণ-জনিত কারণে, সেজন্যে সে ক্ষমাপ্রার্থী। তালিকায় উল্লিখিত দলগুলির মধ্যে অনেকেই উর্দি পরিহিত সরকারি আরক্ষাবাহিনীর হাতে এবং শাসকদলের মস্তানবাহিনীর হাতে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়েছেন। না, তবু তাঁরা কেউ রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাননি। এর মধ্যে ইউনিট থিয়েটারের ওপর শান্তিপুরে স্বৈরশাসনের আঁধারবাহিনীর আক্রমণ তো ইতিহাস হয়ে রয়েছে, ইতিহাস হয়ে রয়েছে শিবপুরে ব্যঞ্জনা-র ওপর আক্রমণ, ইতিহাস হয়ে রয়েছে যান্ত্রিকের প্রতিযোগিতায় কল্লোলের সাজঘরে বোমাবর্ষণ।

বস্তুত রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নে সাতের দশকে মফস্বলের মঞ্চ কলকাতাকে অনেক-অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল বলেই আমরা একদিন মফস্বলের থিয়েটারের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত নিজস্ব চরিত্রকে একটি তাত্ত্বিক অবয়ব দেবার জন্যে চেষ্টা করেছিলাম। এই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যতটা আবেগপ্রসূত ছিল, ততটা যুক্তিসম্মত ছিল না। কিন্তু তাহলেও একথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য—অন্তত সাতের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলিতে মফস্বলের প্রসেনিয়াম থিয়েটার কলকাতা মুখাপেক্ষিতাকে সর্বাংশে বর্জন করে চেষ্টা করেছিল নিজের পায়ে দাঁড়াবার। না, এটা শুধু মতাদর্শগত প্রশ্নই নয়, নিজস্ব একটি নাট্যভাষা খোঁজারও প্রয়াস ছিল তার মধ্যে। একথা সকলেই জানেন অন্তত সেদিন মফস্বলের অস্থায়ী বাঁধা মঞ্চে বা পুরনো ভগ্নপ্রায় প্রেক্ষাগৃহে আলোর সাজ-সরঞ্জামই বলুন বা সেট-সেটিং-ই বলুন, সবই ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নেহাৎই অপ্রতুল। এমন কি টেপরেকর্ডারের আবহ বা কস্টিউম বা মেক-আপের দিক থেকেও মফস্বলের

নাটদলগুলির দৈন্য ঢাকা যেত না। তখন তো প্রগতিশীল নাটক করার জন্যে সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হতো না! ফলে উপকরণগত এই অভাব ও দৈন্যের জন্যে টোটাল থিয়েটারের এফেক্ট মফস্বলের মঞ্চে নিশ্চয়ই পাওয়া যেত না। বহু জায়গাতেই সামান্য স্পট লাইটও পাওয়া যেত না, ফ্লাড লাইটের ছড়ানো আলোয়, এমনকি হ্যাজাকের আলোতেও নাট্যপ্রতিযোগিতা হয়েছে। এই অবস্থায় উপকরণগত বাহুল্যকে বর্জন করে একটি ছিমছাম নাট্যরীতি গড়ে তোলার চেষ্টা হতে থাকে। পরে অনেকে প্রয়াত রাধারমণ ঘোষের নাটককে ব্যঙ্গ করে বলতেন—চারটে ছেলে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে কোমরে রঙিন ফিতে জড়িয়ে হাতে একটা ঢোল নিয়ে এসে হাজির হয়ে নাটক করে গেল! এইসব পণ্ডিতরা বোঝেননি—রাধারমণের এই ফর্মটি গড়েই উঠেছিল মফস্বল বাংলার মঞ্চের সরঞ্জামগত দারিদ্রের ফলে। যতদিন এই দারিদ্র ছিল, ততদিন রাধারমণের জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়েনি।

আরেকটা চেষ্টাও হয়েছিল। আজ কলকাতায় বিভাসবাবুরা "মাধবমালঞ্চী কইন্যা" নামিয়ে দেশজ লোকনাট্যের সঙ্গে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাঙালির নিজস্ব নাট্যভাষা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন বলে প্রচুর সাধুবাদ পাচ্ছেন। সত্যের খাতিরেই বলতে হয়—একাজটাও সাতের দশকেই মফস্বলের মঞ্চে শুরু হয়েছিল। যাঁরা সে সময়ে বহরমপুরের প্রান্তিকের "নানা হে" (রচনা—দিব্যেশ লাহিড়ি) নাটকটি দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন—কী অসাধারণ নৈপুণ্যে স্থানীয় লোকনাট্য গম্ভীরার ফর্মকে মঞ্চে ব্যবহার করেছিলেন ওঁরা! অবশ্য এই ধরনের প্রয়াস খুব বেশি হয়নি।

কিন্তু এতো গেল অতীতের কথা। আজ? আজকে কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে মফস্বলের থিয়েটারের তফাত কোথায়? বিরানব্বই সালে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, না, নেই। ভাল নাটক কম হলেও, কলকাতাতেও হচ্ছে, মফস্বলেও হচ্ছে, মফস্বলের বেশ কিছু দল রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চে এসে দর্শকের প্রশংসা কুড়োচ্ছেন, বহরমপুর ছান্দিকের রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার যে উচ্চমান রক্ষিত হয়, তা কেবল কলকাতার একটি-দুটি দলেই মিলবে। আবার শিল্পবর্জিত অসার নাটক কলকাতাতেও যেমন বেশি হচ্ছে, তেমনই হচ্ছে, মফস্বলেও। দু-জায়গাতেই গ্রুপ থিয়েটার দর্শকের আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু যেখানে ছিল মফস্বলের আসল গর্বের জায়গা—তার রাজনৈতিক অগ্রণী ভূমিকা, সেটা আজ আর মফস্বলের মঞ্চে দেখা যায় না। □